ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৮০ বছরের চালচিত্র

আবদুল মতিন

একটি জাতির জীবনে বিশ্ববিদ্যালয় একটি আলোকবর্তিকাতুল্য। তেমনি কোন জাতির ইতিহাস লিখতে হলে যে ক'টি উপাদান প্রয়োজন তার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সর্বোচ্চ পীঠস্থান তার একটি আকর স্থানীয় স্থাপনা। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা এমন একটি শহরে বাস করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেই শহরেরই একটি শিখা চিরন্তনীর মতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেন আমাদের কাছে মাতৃস্তন্য পানের তথা জ্ঞানের মূল আধার বলে বিবেচ্য। ব্রিটিশ-পাকিস্তানের দু'টি পতাকা বদল করে আমাদের যখন সবুজ জমিনে রক্তলাল সূর্যকরোজ্জ্বল পতাকাটি স্বাধীন বাংলার গর্বিত জাতির মশালচি হিসাবে হাতে এলো, তখন তাকে প্রাণঢালা চুম্বন দিয়েছিলাম। অনেক রক্তের মূল্যে কেনা এই রক্তিম পতাকা। আমাদের মুহূর্তে সভ্যতার জঙ্গম চেহারার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সারা পৃথিবীতে আজ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে নব নব আবিষ্কারের দুন্দুভি বাজছে, তখন আমরা আবার নতুন করে স্মরণ করি "প্রাচ্যের অক্সফোর্ড" আমাদের গর্বের ধন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। এখানে নিহায়তই একটি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করতে চাই। সেই সুদূর ১৯৫৭ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র কয়েক মাসের জন্য ভর্তি হয়েছিলাম। সাবজেক্ট ছিল 'বাংলা' এবং 'আইনশাস্ত্র'। সে সময় একসাথে দু'টি সাবজেক্ট নেয়া যেত। তবে আমার এই অভিযান কোনমতেই সফল হতো না যদি সুহৃদ ডক্টর আনিসুজ্জামান না থাকতেন।

বাংলা ডিপার্টমেন্টের হেড তখন অধ্যাপক আবদুল হাই। আনিস সাহেব ভর্তির ফরমখানি তাঁর হাতে দিলেই তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, "এই কাজে আমি আর সম্মতি দেব না। এই সব ছেলেরা পড়াশোনা করে না। করে রাজনীতি। ফেল তো করে দু'টি সাবজেক্টেই। অতএব, যথেষ্ট আর নয়।" কিন্তু স্যারের প্রিয় ছাত্র আনিসের অনুরোধে তিনি আমাকে ভর্তি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমার আদতে ফাঁকি দেয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মাত্র তিন মাস ক্লাস করার পরই একটি জরুরী পারিবারিক কারণে এই বিদ্যাপীঠ ছেড়ে পাড়ি জমাতে হয়েছিল রাজশাহীতে। সেখানে পরীক্ষার মাত্র চার মাস আগে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর ইংরেজী বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু আজও যখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে যাই তখনই একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। হায়, এখানে পড়া আর হলো না! আজ দীর্ঘকাল পরে যখন দিনান্তে-নিশান্তে শুধু মনে পড়ে আমরা অনন্তের পথে যাত্রায় নৌকায় পাল লাগিয়েছি– তখনই রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

"একদিন এই পথকে মনে হয়েছিল আমারই পথ, একান্তই আমার; এখন দেখছি, কেবল একটিবার মাত্র এই পথ দিয়ে চলবার হুকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়। নেবুতলা উজিয়ে, সেই পুকুর পাড়, দ্বাদশ দেউলের ঘাট, নদীর চর, গোয়াল বাড়ি, ধানের গোলা পেরিয়ে, সেই চেনা চাউনি, চেনা কথা, চেনা মুখের মহলে আর একটিবারও ফিরে গিয়ে বলা হবে না, 'এই যে!'

এ পথ যে চলার পথ; ফেরার পথ নয়।

আজ ধূসর সন্ধ্যায় একবার পিছন ফিরে তাকালুম; দেখলুম, এই পথটি বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী ভৈরবীর সুরে বাঁধা।"

(সূত্র ঃ 'পায়ে চলার পথ/লিপিকা')

বলি, হায়রে জীবন! তুমি এত ছোট্ট কেন! সত্যিই রবীন্দ্রনাথ আমার নিজের মনের কথাটিই কতকাল আগে লিখে গেছেন। তাই তো তিনি সব সত্ত্বেও আমার চেতনায় ঋষি রবীন্দ্রনাথ।

গত জুলাই ৫ ও ৬ তথা বৃহস্পতি ও শুক্রবার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ বছর পূর্তির গৌরবময় অধ্যায় উপলক্ষে ক্যাম্পাসে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠানের অবদান যে কত বড়, কত বহুমুখী তা আরেকবার আমাদের মগ্নচৈতন্যে কালের ঘণ্টা জানিয়ে দিয়ে গেল। স্মৃতি তো সততই সুখের। দুঃখের রাশি রাশি স্মৃতি থাকলেও তা সুখসাগরে হারিয়ে যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র এই ৮০ বছরে সারা বাংলাদেশের সমাজের সর্বস্তরে রাশি রাশি আলো ছড়িয়েছে, এখনও তার আলোর ছটা সমাজের আরও গভীরে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ তো আসলেই আলোকের এক ঝর্ণাধারা তাই এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের কয়েকটি পাতা তুলে ধরতে হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদে হতাশ পূর্ব বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দকে খুশি করার জন্য তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। মাত্র দু'দিন পরই অর্থাৎ ২ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ অনুমোদন করে ব্রিটিশ সরকার। সেই ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ পাস হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটি এ্যাক্ট। এর এক বছর পর ১৯২১ সালের ১ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যার প্রথম চ্যান্সেলর হন তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড লিটন।

এর পর কলা অনুষদের ২৮ জন, বিজ্ঞান অনুষদের ১৭ জন এবং আইন অনুষদের ১৫ জন-- মোট ৬০ শিক্ষক এবং ১২টি বিভাগ নিয়ে যাত্রা শুরু, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিএ, বিএসসি পাস ও অনার্স এবং এমএ ও এমএসসি ক্লাসে মোট ৮৭৭ ছাত্র নিয়ে শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস। আর আজ ১০টি অনুষদ, ৮টি ইনস্টিটিউট, প্রায় ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী, ১ হাজার ২০০ শিক্ষক নিয়ে এই বিদ্যাপীঠ পরিণত হয়েছে এক বিশাল মহীরুহে।

কিছুদিন আগে এ বিশ্ববিদ্যালয় পালন করেছে ৪১তম সমাবর্তন উৎসব। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয় নিজেকে নানারূপে প্রকাশ করেছে। শিক্ষার আলো ছড়াতে, বাংলার ভাগ্যবঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ে, ভাষা আন্দোলন, ১১-দফার আন্দোলন, আইয়ুবের মার্শাল ল বিরোধী আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধসহ সকল আন্দোলনের অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছে। 'এ গ্যালাক্সি অব ব্রিলিয়ান্ট স্টারস' তথা এক রাশি উজ্জ্বল তারকা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোকবর্তিকার কাজ করেছে। এঁদের মধ্যে কয়েক মনীষীর নাম তুলে ধরা হলো। তাঁরা হচ্ছেন বিজ্ঞানী সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা, মহান ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, চর্যাপদের আবিষ্কর্তা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্যার এএফ রহমান, জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, দার্শনিক গোবিন্দচন্দ্র দেব, সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু ও মুনীর চৌধুরী প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিগত ৮ দশকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট ২৩ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ভিসির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর স্যার পিজি হার্টগ, প্রফেসর জিএইচ ল্যাংলি, স্যার এএফ রহমান, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. মাহমুদ হাসান, ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, ড. ডব্লিউ এ জেনকিন্স, বিচারপতি মুহম্মদ ইব্রাহিম, বিচারপতি হামুদুর রহমান, ড. মাহমুদ হোসেন, ড. মোহাম্মদ ওসমান গনি, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, ড. মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী, ড. আব্দুল মতিন চৌধুরী, অধ্যাপক মুহাম্মদ শামসউল হক, অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক, ড. আব্দুল মান্নান, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া, অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক শহীদ উদ্দিন আহমেদ এবং বর্তমানে ভিসির পদ অলঙ্কৃত করে আছেন ড. একে আজাদ চৌধুরী। এখানে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৯৯ সালে ১৮ জানুয়ারি ৪০তম সমাবর্তন উৎসবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ডক্টর অব ল' এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব সায়েন্স' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বাঙালীর সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে বাঙালীর সোনার সন্তানকে এক মহান সম্মানে ভূষিত করার আনন্দই আলাদা। সেইখানে ডক্টর অমর্ত্য সেন প্রদত্ত ভাষণের কিছু অংশ আপনাদের মনোনিবেশের জন্য এখানে তুলে ধরছি–"আপনারা নিঃসন্দেহে লক্ষ্য করেছেন যে, আপনারা এ সহস্রাব্দের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জন করেছেন। আর মাত্র দু'সপ্তাহ পর আমরা নতুন সহস্রাব্দে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। আপনারা শুধু এই শতাব্দীরই শেষ গ্র্যাজুয়েট ব্যাচ নন, আপনারা এ সহস্রাব্দের অন্য গ্র্যাজুয়েটদেরও সর্বশেষ ব্যাচ। পরবর্তী ব্যাচের গ্র্যাজুয়েটরা এক অজানা নতুন সহস্রাব্দে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। তবে এ কথাও ঠিক যে, শেক্সপীয়র থেকে চার্লস ডিকেন্স, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে কাজী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত কেউই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী নেননি। কিন্তু জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁরা যে সৃজনশীল অবদান রেখেছেন তা বিস্ময়কর। তার পরও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উপযোগিতার কথাও আমি জোর দিয়ে বলব। এ শিক্ষা শুধু ব্যক্তিগত জীবনে পরিবর্তন আনে না, তা সামাজিক পরিবর্তনকেও ত্বরান্বিত করে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে কার্ল মার্কস, মহাত্মা গান্ধী, মার্টিন লুথার কিং, নেলসন ম্যান্ডেলা, মিখাইল গর্বাচেভ, আউং সান সুচি এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো মহান নেতারাও বেরিয়ে এসেছেন।

তাই দেখতে পাচ্ছি 'বিন্দুতে সিন্ধুই' হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দান। আমাদের গর্বের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো আমাদের এক আলোর ঝর্ণাধারার মুখে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়। জ্ঞানের রাজ্যের তো কোন শেষ সীমানা নেই। তবুও আমরা সাধারণ জনভিক্ষুকের মতো ঐ জ্ঞানের সীমাহীন জলাধার থেকে বিন্দু বিন্দু তৃষ্ণার পানি পাওয়ার জন্য আজীবন জেগে থাকব। কারণ আমরা এই মানবসত্তাকে মানুষের মঙ্গলের জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য কাটিয়ে দিতে চাই। আবার ফিরে আসি রবীন্দ্রনাথে। তাই জ্ঞানের বাতিঘর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাক্ষী রেখে বলে উঠি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঃ

"পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান
তার বেশি করে না সে দান
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান,
আমি গাই গান।"

বিস্মিত বালকের মতো আমরা তাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি কবিগুরুর দিকে।

তথ্যচিত্র

- ০১ জুলাই ১৯২১ সালে মাত্র তিনটি অনুষদে (কলা, বিজ্ঞান ও আইন) ১২টি বিভাগ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।
- স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিজয়ের মাত্র দু'দিন আগে (১৪ ডিসেম্বর) পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ মেধাবী শিক্ষককে হত্যা করে।
- স্বাধীন বাংলাদেশে দীর্ঘ ৩০ বছর পর ঢাবির প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৯ সালে। এর আগে ৩৯ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছিল মার্চ ১৯৬৯-এ।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ ৮০ বছরে বিভিন্ন দেশের ৩৬ ব্যক্তিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখায় সম্মানসূচক ডিগ্রী দেয়া হয়েছে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৮৭৭। এর মধ্যে ছাত্রী ছিল মাত্র ১ জন।

গ্রন্থনা ❑ রিসার্চ রেফারেন্স সেল, জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...